Journal of Sociology
Vol. 14 Issue 1 & 2, 2023
ISSN: 1813-2871

Nazmul Karim Study Center
University of Dhaka

সমাজতত্ত্বে তর্ক-বিতর্ক
(Debates in Sociology)

ড. মনিরুল ইসলাম খান*

Abstract

This paper focuses on the theoretical debates in sociology that acted as the driving force in its course of development drawing heavily from the thinking of Alvin Gouldner. Revolutionary transformation in the French society in late eighteenth century and the subsequent social disorder created the background of the development of positivism by Comte with the advocacy of restoring social order. Intermingling of different theories also took place as in the case of positivism furnishing the context for the emergence of structural functionalism. Interpretative sociology brought new dimension to the understanding of social phenomena by highlighting the perspective of the actors instead of the observer. In this vein it also discusses the emergence of intersubjectivity, ethnomethodology and related theoretical views. For obvious reason the paper deals elaborately with the perspective of Marxism. It underlines that structural functionalism presents society as an interwoven equilibrium while Marxism views the same as a conflicting whole with the effect of domination by the ruling class. This paper elaborates on the basic tenets of historical materialism as couched in Marxism. However, Marxist prognosis faltered in advanced capitalist countries of the Western hemisphere calling for new theoretical insight. Within Marxism it happened by examining the causal background of the continuation of capitalist countries, elaborated in this paper in the section on structural Marxism. The premise of sociology also necessitated the emergence of Durkheim and Weber who argued for different perspectives for the understanding of social order. The contributions of system theory and interactionism are duly acknowledged in this paper to weave a comprehensive intellectual tapestry being linked with debates and argumentation. The parallelism of system and individual brought dualism in sociological theory and Anthony Giddens took up attempt to draw a conflation between the two, unfolding a new dimension in the debate ridden sociological theories. The paper

* অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল: mikdu1070@gmail.com

DOI:

concluded with the discussion of Derrida and Lyotard to unfold the novel approach of post-modernism in challenging the claim of universality of modern theories.

যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথে তুলনা করা হয়, তবে সমাজবিজ্ঞান একটি আলাদা ধরনের বিজ্ঞান।[1] এই বৈসাদৃশ্য তর্ক-বিতর্কের অন্যতম একটি উৎস। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেও তর্ক বিতর্ক আছে তবে তার ধরন আলাদা। সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বিষয় মানুষ ও তাদের আন্তঃসম্পর্ক। মানুষের মন, চেতনা ও সংস্কৃতি মানুষকে ভিন্নতা দিয়েছে, যা সমাজ বিজ্ঞানের আলাদা চরিত্রের পেছনের একটা বড় কারণ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান জড় বস্তু বা জীবজগৎ নিয়ে কাজ করে, তাদের মন বা সংস্কৃতি বলতে কিছু নেই, তাই ঐ বিজ্ঞানটাও আলাদা, যেখানে অপরিবর্তনীয় সূত্রের ছড়াছড়ি, তেমনটা সমাজবিজ্ঞানে নয়।

সমাজবিজ্ঞানের তর্কের ইতিহাসটাও পুরনো, যদি দার্শনিকদের প্রাসঙ্গিক ভাবনা আমরা বিবেচনার মধ্যে নেই। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো বা এরিস্টটল দাস প্রথাকে স্বাভাবিক মনে করেছিলেন, যা বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনা বলে মনে করা হয়। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী এ্যালভিন গোল্ডনার তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থে[2] সমাজতত্ত্ব বিকাশের যে যুগভাগ করেছিলেন তাতে প্রথম যুগকে দেখিয়েছেন দৃষ্টবাদী যুগ, যেখানে প্রধান অবদান সাঁ সিঁমো ও অগাস্ট ক্যোঁৎ এর। দ্বিতীয় যুগকে চিহ্নিত করেছেন মার্কসবাদ দিয়ে, আর এই পর্বে সমন্বিত হয়েছে জার্মান ভাববাদ, ফরাসি সমাজতন্ত্র এবং ইংরেজ অর্থনীতিবিদদের ভাবনা। তৃতীয় যুগ ধ্রপদী সমাজবিজ্ঞান। এই যুগে আমরা পাই ভেবার, ডূর্খিম ও পেরেটোর চিন্তার সরব উপস্থিতি। চতুর্থ যুগে আমরা পাচ্ছি কাঠামোবাদী ক্রিয়াবাদ যার প্রতিফলন দেখতে পাই ট্যালকট পারসনস্ এর রচনায়। ১৯৩০ দশকে এই পর্বের শুরু। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ সমাজবিজ্ঞানীদের অবদান এই পর্বকে আরও সমৃদ্ধ করেছে যার মধ্যে আছেন রবার্ট মারটন, কিংসলে ডেভিস, উইলবার্ট মুর বা রবার্ট উইলিয়ামস এর মত ব্যক্তিবর্গ। এই প্রবন্ধে মনোযোগ আরো বর্ধিত করা হবে বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে যে তর্কগুলো হয়েছে তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

অগাস্ট ক্যোঁৎ ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এবং তাঁকে এই শাস্ত্রের জনকও বলা হয়। তিনি সাঁ সিঁমোর ঘনিষ্ঠ সহযোগী। বুদ্ধির পুনর্জাগরণ এবং ফরাসি বিপ্লব ফ্রান্সে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের চিন্তাভাবনার সুযোগ এনে দেয়। সামন্ত যুগের প্রবল শ্রেণী যেমন সামন্ত প্রভু বা খ্রিষ্টীয় যাজকদের ক্ষমতাকে আঘাত করা হয়েছে এবং এই বিপ্লবের নেতৃত্বে রয়েছেন নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাতে অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায়ী বর্গ এবং সাধারণ জনগন। পুজিঁবাদ তখন বিকশিত হচ্ছে এবং উপযোগিতাবাদ ভাবনার জগতকে নাড়া দিচ্ছে। এখানে ঐতিহ্য এবং ধর্মের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে, সামন্ত প্রভুদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, যাজকদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। সেই শূন্যস্থান দখল করেছে নতুন মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্যরা। এই পরিবর্তন সহিংস বিপ্লবের মাধ্যমে সংঘটিত হচ্ছে এবং প্রচন্ড রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছে ফ্রান্সে। ফরাসী বিপ্লব ও পরের কয়েক দশকে ঘন ঘন সরকার পতন হয়েছে, এবং বিপ্লবীরা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে এবং প্রতি বিপ্লবীরা যাদেরকে পুনরুদ্ধারকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে, তারা ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। অভিজাতদের সম্মান জানাতে চেয়েছেন।

---

1. Raymond A. Morrow and David D. Brown (1994), Critical Theory and Methodology, (Vol. 3), Sage Publications: USA.
2. Alvin Gouldner (1971), The Coming Crisis of Western Western Sociology, Heine Mann: UK.

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের চাইতে সমাজের বাঁধনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ক্যোঁৎ এর সমাজচিন্তা এই প্রেক্ষিতে বিকশিত হয়েছে এবং দৃষ্টবাদী সমাজবিজ্ঞানের সূত্রপাত ঘটেছে। বুদ্ধির পুনর্জাগরণের দার্শনিকেরা শুধু প্রত্যাখ্যানকে গুরুত্ব দিয়েছেন, সেখানে ক্যোঁৎ গ্রহণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, যার ধারাবাহিকতায় দৃষ্টবাদের মূল তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। সমাজ যেমন বদলাবে একইভাবে স্থিতিশীলও থাকতে হবে। ঐতিহ্যকে শুধু প্রত্যাখ্যান করলেই চলবে না গ্রহণযোগ্য দিকগুলোও খুঁজে বের করতে হবে। ক্যোঁৎ এর সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক গতিশীলতা তত্ত্বের গুরুত্ব এই প্রেক্ষিতে উপলব্ধি করা সম্ভব[৩]। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ বনাম সামষ্টিকতাবাদ যদি বেঁছে নেওয়ার বিষয় হয়, দৃষ্টবাদ দ্বিতীয়টিকে বেছে নেবে। জ্যাকোবিনদের বিপ্লবী চেতনা এবং পুনরুদ্ধারকারীদের প্রতিক্রিয়াশীলতাকে পাশ কাটিয়ে দৃষ্টবাদ বিজ্ঞানকে স্বাগত জানিয়েছে, শিল্পতন্ত্রকে সমর্থন দিয়েছে, পরিবার, সমাজের বন্ধন, স্থিতিশীল প্রক্রিয়া ইত্যাদির স্বপক্ষে মতামত দিয়েছে।[৪] দৃষ্টবাদ স্থিতিশীলতার পক্ষের একটি সামাজিক দর্শন, যা প্রকারান্তরে বিকাশমান-পুঁজিবাদী সমাজের স্বপক্ষ একটি দর্শন হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

অগাস্ট ক্যোঁৎ এর চিন্তা এবং ফরাসি সমাজবিজ্ঞান বিকাশের ধারা জীববিজ্ঞান কর্তৃক যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছে।[৫] এর একটি তাৎপর্য সমাজকে জীবদেহের সাথে তুলনা করা। সমাজের একটা দেহ আছে এবং এই সমাজদেহ যেসব উপাদান দিয়ে তৈরি তাদের সম্পর্ক আন্তনির্ভরশীলতার। ডুর্খীম যখন শ্রম বিভাজন প্রক্রিয়ার জৈবিক সংহতি তত্ত্ব প্রদান করলেন তাতে সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আন্তনির্ভরশীলতার বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট চিন্তা ধারণ করল। এভাবে ক্রিয়াবাদের সূত্রপাত। এই তত্ত্ব মনে করে সমাজ দেহের মধ্যে যে আন্তনির্ভরশীলতা তা থেকে সূচিত হয়েছে সামাজিক ভারসাম্যের প্রক্রিয়া। সমাজ নিজস্ব ধারায় এই ভারসাম্য তৈরি করে এবং সমাজের বাঁধনকে ধরে রাখতে পারে। সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন একে অপরের পরিপূরক তেমনি সমাজের গোষ্ঠী সমূহও। প্রয়োজনহীন কিছুই সমাজে টিকে থাকতে পারে না, তাই পারস্পরিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে তৈরি হয় আন্তনির্ভরশীলতা এবং ভারসাম্য। এই তত্ত্বের সবচেয়ে বড় উপকারটা পেয়েছে সেই সময়ের বিকাশমান পুঁজিবাদী সমাজ। ফরাসি বিপ্লব উত্তর যে বিশৃঙ্খলা তা বৃহত্তর সামাজিক প্রক্রিয়ায় অনাহুত এবং স্থিতিশীলতা কাম্য। ফ্রান্সে উনবিংশ শতাব্দীতে যে মধ্যবিত্ত এবং বুর্জোয়া শ্রেণী বিকাশ লাভ করছিল তারা এই পর্যায়ে নিজেদের সংযত করলো, স্থিতিশীলতার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করলো। উগ্রপন্থা সমাজের জন্য ক্ষতিকর এমন ধারণা সূত্রপাত তারা করলো, যদিও এই উগ্রপন্থার মাধ্যমেই ফ্রান্সে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে, সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে গিয়েছে, অভিজাত শ্রেণীর রাজনৈতিক পতন হয়েছে, মধ্যবিত্ত শক্তিশালী হয়েছে। বিরাজমান উগ্রপন্থা থেকে যদি আরো বিপ্লবী দাবি উঠে সেটা ছিল উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণীর একটি ভীতি, তাই তাদের স্থিতিশিলতার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন। সাম্য ও স্বাধীনতা ফরাসি বিপ্লবের বাণী, কিন্তু এই বাণী যদি উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণির বিপক্ষে যায়, তাহলে সেই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হওয়াটা ছিল তাদের জন্য অসম্ভব। সুতরাং ক্রিয়াবাদ তত্ত্ব এবং দৃষ্টবাদ নতুন বুর্জোয়া সমাজের তাত্ত্বিক আদর্শ হিসেবে আবির্ভূত হলো। কোঁৎ নিজেও ভাবলেন বিজ্ঞান এবং জ্ঞান চর্চা দিয়ে সমাজকে পরিবর্তন করা সম্ভব। উগ্রপন্থা বিপ্লব বা বিশৃঙ্খলা আর দরকার নেই ফ্রান্সে।[৬]

---

3. Jonathan H. Turner, Leonard Beeghley and Charles H. Powers (2012), The Emergence of Sociological Theory, Sage: USA (seventh edition).
4. উপরে উল্লেখিত
5. Anthony Giddens (1978), Introduction in Positivism and Sociology, Heine Mann: UK (edited by Anthony Giddens & originally published in 1974)
6. Alvin Gouldner, (1971), প্রাগুক্ত

দৃষ্টবাদ আরো পরিবর্তন নিয়ে আসলো যখন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুসন্ধান পদ্ধতিকে সমাজবিজ্ঞানের জন্য উপযোগী মনে করা হলো। পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ, হিসাব কষা বা ভবিষ্যৎবাণী করা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি যা দিয়ে জ্ঞান অর্জন সম্ভব, তত্ত্ব তৈরি সম্ভব, বিশ্লেষণ বা বাস্তবতাকে প্রভাবিত করে কাঙ্খিত পথে পরিচালনা করা সম্ভব। কিন্তু শুরু থেকেই দৃষ্টবাদী পদ্ধতির প্রসার সমাজবিজ্ঞানে খুব সহজভাবে আগায়নি। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সমাজবিজ্ঞানী দৃষ্টবাদী তত্ত্বে স্বাচ্ছন্দ বোধ করলেও, জার্মানীতে এর ব্যত্যয় ঘটলো।[৭] মানুষের আচরন জড় বস্তুর আচরন হতে আলাদা। মানুষ চেতনার অধিকারী, সুতরাং তার কর্মকান্ড বুঝে শুনে হয়। মানুষ যেটা করে, সেটা কি সেভাবে করা যাবে,বা যাবে না বিবেচনার মধ্যে নেয়। সুতরাং মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করতে গেলে, তার মনের ভাবটাও বুঝতে হবে, যে বোধ থেকে সে কাজটি করছে। ভেবার সমাজবিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা নির্ভর একটি বিজ্ঞান বললেন। মানুষের সব আচরণ বা কাজকর্ম হিসেব কষে বা ছক কেটে হয় না। উদ্দেশ্য ও পথের সঠিক সর্ম্পক যদি যৌক্তিক আচরণের সংজ্ঞা হয়, মানুষের অনেক আচরণই এই ধরনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন ঐতিহ্য বা মূল্যবোধ তাড়িত আচরণ সমূহ। তাই মানুষের আচরণকে বস্তুনিষ্ট মানদন্ডে দাড় করানো মুশকিল, যে কারনে শূটজ্ একে আন্তঃচেতনামূলক বললেন। অর্থাৎ অনেকে যখন একটি আচরণে অভ্যস্ত হয়, সেটাই একটি তুলনীয় মানদন্ডে রূপান্তরিত হয়। শূটজ আরো মনে করেন যে গবেষকের অনুমিত মানের সাথে যিনি কাজটি করছেন, তার ভাবানার মিল নাও থাকতে পারে, তাই পর্যবেক্ষন প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। উদ্দেশ্য ও পথের সঠিক সর্ম্পককে যৌক্তিক আচরণের ভিত্তি ধরেছেন ভেবার, কিন্তু মানুষের অসংখ্য আচরণ এই ছকের বাইরে। তাই গারফিংকেল বললেন যে, যা যুক্তির বাইরের আচরণ বলে মনে করা হয়, সেটাই হতে পারে গবেষণার সূচনা। উদ্দেশ্য ও পথ সঠিকভাবে যুক্ত এমন আচরণের কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা সম্ভব বা ভবিষ্যৎ বাণীও করা সম্ভব, তাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি একেবারে ব্যবহার করা যাবে না এমনটা নয়। মানুষ তার পছন্দ অনুযায়ী চলে তাই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আচরণগত ভিন্নতা থাকতে পারে কিন্তু আন্তঃচেতনামূলক কাঠামোর চাপে মানুষের আচরণকে একটা ছকের মধ্যে থাকতে হয়, সুতরাং এখানে কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ সম্ভব। কিন্তু প্রথা সবসময় সঠিক কারণ নাও হতে পারে। যেমন ঝাড় ফুঁক প্রথাগত চিকিৎসা, বিজ্ঞান ভিত্তিক নয়। তবে অভিন্ন ব্যাখ্যা নির্মাণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বাস্তবতা মনে রাখতে হবে। যে সামাজিক সত্য এক যুগের জন্য প্রযোজ্য অন্য যুগের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। যেমন গ্রাম বাংলার সালিশ এর প্রাসঙ্গিকতা বহুলাংশে কমে গেছে সাম্প্রতিক সময়ে।

দৃষ্টবাদের পর যে পর্বটির কথা গোল্ডনার বলেছেন তা হলো- মার্ক্সবাদী পর্ব। মার্ক্সবাদ শুধু নতুন বিশ্লেষণের ছকই দেয়নি সমাজবিজ্ঞানের প্রতিপক্ষ একটি শাস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তবে সমাজবিজ্ঞান বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মার্ক্স এর চিন্তাভাবনা পাঠ করে থাকে।

ক্রিয়াবাদ ও দৃষ্টবাদ সমাজকে আন্তঃনির্ভরশীল একটি সমষ্টি মনে করে থাকলে, মার্কসবাদ সেটা একটি দ্বান্দ্বিক সমষ্টি মনে করে[৮]। পশ্চিম ইউরোপ আদিম সাম্যবাদী অবস্থা থেকে ব্যক্তি

---

7. Anthony Giddens (1978), প্রাগুক্ত
8. মার্কস এবং এঙ্গেলস এর তত্ত্ব ও মতবাদ একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় রচিত হয়েছে। তাঁরা হেগেলের ভাববাদ, এ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিচার্ডের অর্থনৈতিক চিন্তা ও ইউরোপে প্রচলিত তৎকালিন সমাজতান্ত্রিক ভাবনাকে আলোচনা ও সমালোচনার মাধ্যমে নিজেদের ভাবণাকে উপস্থাপন করেন। এই প্রবন্ধে মার্কস ও এঙ্গেলস সংক্রান্ত আলোচনা নিম্নলিখিত সূত্র থেকে আহরিত: Economic And Philosophic Manuscripts Of 1844 (Progress publisher, USSR, 1977, fifth revised edition; A Critique Of The German

সম্পত্তি সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে একটি শ্রেণী বিভক্ত সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে। শ্রেণী বিভাজন সামাজিক বৈষম্য নিয়ে এসেছিল সাথে সাথে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ও তৈরি করেছিল। মার্কস তাঁর লেখায়, দর্শন, অর্থনীতি ও ইতিহাসের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। ইতিহাসের পরিবর্তনকে হেগেল দেখেছিলেন চেতনা বা ভাবের ক্রিয়াশীলতার ফলশ্রুতি হিসেবে। একাধিক গ্রন্থে মার্কস এই বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে বিপরীত চিন্তা উপস্থাপন করেছেন। মার্কস চেতনাকে দেখেছেন অনেকটা রসদের মত, এর অন্তর্নিহিত সত্তা বা যাকে 'খাঁটি চেতনা' বলা হয় এমন কিছু নেই, বাস্তবতার আলোকে চেতনা সক্রিয় হয়ে উঠে, একে ব্যবহারিক চেতনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাহলে মানুষের কর্মকান্ডের মূল ভিত্তিটি কি? মার্কসবাদ অনুযায়ী জৈবিক ভাবে বেঁচে থাকা এবং সেই লক্ষ্যে উৎপাদন কর্মকান্ড পরিচালনা করাটা প্রধান কাজ। উৎপাদনের কাজ এককভাবে সংঘটিত হলেও প্রথম থেকেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে তাকে একটি সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ হতে হবে, সেটা তার প্রাত্যহিক কথোপকথনের সময় বা সন্তান সন্ততি উৎপাদনের সময়। মানুষের চেতনা, উৎপাদন কর্মকান্ড এবং সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া সবই একই সুত্রে গ্রথিত হয়েছে। বস্তগত শ্রম থেকে মানসিক শ্রম যখন আলাদা হয়েছে তখন মানুষ বিমুর্ত- তাত্ত্বিক চিন্তা করেছে, তবে এখানে চিন্তা কখনই মানুষের কর্মকান্ডের পরিচালক হিসেবে আবির্ভূত হয়নি, বরং বাস্তবতার আলোকে তা ক্রিয়াশীল হয়েছে, পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের কাজ বাস্তবতার সেতুবন্ধন রচনা করেছে বলে আমরা বলতে পারি। মার্কস এর উপরের ভাবনাগুলি সমাজবিজ্ঞানের জন্য যতটা মুখ্য হয়েছে, তার চাইতে বেশি হয়েছে সম্পত্তির বিবর্তনের ইতিহাস। মার্কস তাঁর সমসাময়িক পুঁজিবাদী সমাজকে একাধিক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন। এই পুঁজিবাদী সমাজেই সমাজবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু এবং প্রধান সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এটি একটি ভারসাম্য উপযোগী সমাজ যতই ভেতরে টানাপোড়ন থাকুক না কেন।

মার্কস এর মতে মানুষের সমাজের সূচনা কৌম সমাজের ভেতর দিয়ে সেই সমাজে সংগ্রহমূলক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যেমন মাছ ধরা, শিকার করা ইত্যাদির মধ্যে সীমিত ছিল। সমাজ কাঠামোতে ছিলো একজন পিতৃতান্ত্রিক কর্ণধার এবং অপরাপর সদস্যবৃন্দ। এই কাঠামোর মধ্যে এক সময় আবির্ভূত হয়েছে দাস, যারা যুদ্ধে পরাস্ত অন্য কোন গোষ্ঠী থেকে আসতে পারে। দাসের সংখ্যা বাড়ার প্রক্রিয়ায় নাগরিক ও দাস শ্রেণীর উদ্ভব। নাগরিকবৃন্দ দাস প্রভু। ইতিমধ্যে একাধিক কৌম একত্রিত হয়ে নতুন সমাজের পত্তন করেছে, যা নগর কেন্দ্রিক সমাজ। গ্রীস এবং রোম এর ইতিহাসের প্রেক্ষিতে মার্কস এর এই বিশ্লেষণ। এখানে কৃষি থেকে আলাদা হয়েছে শিল্প এবং বাণিজ্য। এই শিল্প আধুনিক শিল্পের মতো এতটা অগ্রসব নয়। দাস সমাজেও ব্যক্তিগত সম্পত্তি আবির্ভূত হয়নি কেননা দাস এর মালিকানা বৃহত্তর সমাজের হাতে, সুতরাং এই মালিকানা সম্প্রদায়গত যদিও শ্রেণী বিভক্তি ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু দাস সমাজে ক্ষুদ্র কৃষকের উপস্থিতি লক্ষণীয় মার্কস এর বর্ণনায়। কিন্তু কৃষি, দাস উৎপাদন ব্যবস্থায় নগরকেন্দ্রিক শিল্প ও ব্যবসার তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব ইতিমধ্যে আবির্ভূত। দাস ভিত্তিক রোম সম্রাজ্যের শক্তি ধীরে ধীরে কমতে থাকে, ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পের উৎপাদন ও সীমিত হতে থাকে। এমন দুর্বল অবস্থায় জার্মানীয় বর্বর গোষ্ঠীর আক্রমণ ও বিজয়। এই গোষ্ঠীটি নতুন ধরনের মালিকানা ব্যবস্থার পত্তন ঘটায় যা ছিল গ্রাম কেন্দ্রিক। কৃষি হয়ে উঠল এই নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার মুখ্য ক্ষেত্র। আবির্ভূত হল সামন্ত প্রভু ও সামন্ত

Ideology (Progress publisher, USSR, 1968); Manifesto Of The Communist Party (first published in 1847, Marxists Archive 2000); A Contribution To The Critique Of Political Economy (first published 1859, Progress Publisher: USSR, 1976).

দাস। এই সামন্ত দাস ক্ষুদ্র কৃষকের অধস্তন অবস্থান। সামন্ততন্ত্রে আরও যুক্ত হলো যাজক সম্প্রদায় যারা ওই উৎপাদন ব্যবস্থায় ছিল ধর্মীয় ভাবাদর্শের ধারক। সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় ক্রমাগত ভাবে শহর কেন্দ্রীক ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বিকশিত হতে থাকে, যা এক সময় নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা আবির্ভাবের ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা পরবর্তীতে পুঁজিবাদ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। উপরে অতি সংক্ষেপে কয়েক সহস্র বৎসরের সমাজ পরিবর্তনের একটি সারাংশ প্রদান করা হলো, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে। তা হল সমাজের দ্বান্দ্বিক অবস্থার চিত্র বর্ণনা করা এবং কিভাবে শ্রেণী আধিপত্য সমাজকে স্থিতিশীল রাখে সেই বক্তব্যটি প্রনিধান যোগ্য করে তোলা। মার্কসবাদ সমাজবিজ্ঞানে শক্ত আসন নিয়ে বিরাজমান যা এলভিন গোল্ডনার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং সমাজবিজ্ঞানে দুটি বিপরীত মুখি ধারার সরব উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি।

মার্কস তার পুঁজি বিষয়ক গ্রন্থ রচনার আগে সমাজ পরিবর্তনের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্বটি সুস্পষ্টভাবে গ্রথিত করেছেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ অপরিহার্যভাবে উৎপাদন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। যেমন পুঁজিবাদী সমাজে যাদের কোন উৎপাদন যন্ত্রের উপর মালিকানা নাই তাদেরকে শ্রমিক হিসেবে যুক্ত হতে হয় উৎপাদন যন্ত্রের মালিকদের সাথে যাদের বুর্জোয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে মার্কসীয় সাহিত্যে। এভাবে রচিত উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদন শক্তির সমন্বয়ে তৈরি হয় উৎপাদন ব্যবস্থা। উৎপাদন শক্তির বিকাশ অপরিহার্য কেননা সমাজের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। যদি উৎপাদন শক্তির বিকাশ বিরাজমান উৎপাদন সম্পর্কের সাথে সংগতিপূর্ণ না হয় তখন প্রয়োজন হয় উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন। এই প্রেক্ষিতটিই তৈরি করে সমাজ বিপ্লবের বিষয়টি। এখানে শ্রেণী দ্বন্দ্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করে। এই প্রক্রিয়ায় ইতিহাসে বিভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থা পরিলক্ষিত, যেমন এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা, দাস উৎপাদন ব্যবস্থা, সমাজতন্ত্র বা পুঁজিবাদ। উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজে মৌল ভিত্তি রচনা করে যার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় রাজনীতি ও মতাদর্শ ব্যবস্থা। বৃহত্তর সমাজের রাজনীতি ও মতাদর্শ ব্যবস্থা উৎপাদন ব্যবস্থা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত উপাদান হিসেবে বিবেচিত। অর্থাৎ বিরাজমান উৎপাদন সম্পর্কের প্রয়োজনেই তৈরি হয় রাজনীতি ও মতাদর্শ ব্যবস্থা। যেমন সামন্ততন্ত্রে অভিজাত শ্রেণি নিয়ন্ত্রণ করেছে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও বিভিন্ন মতাদর্শ। বিভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রেণী সম্পর্ক একটি দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি পুঁজিবাদী সমাজের দ্বন্দ্ব সৃষ্টির একটি প্রধান কারণ, সর্বহারা শ্রেণী এই উৎপাদন ব্যবস্থায় শোষিত ও বিচ্ছিন্ন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত হয়ে যখন সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে উৎপাদন যন্ত্রের ওপর, সমাজ হবে দ্বন্দ্ব মুক্ত, অর্থাৎ সমাজ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানে সমাজিক সম্পর্ক তৈরি হবে শোষণমুক্ত ভাবে। মার্কস মনে করেন যে পুঁজিবাদী সমাজে ক্রমাগত পুঁজি সঞ্চয়নের প্রক্রিয়ায় অর্জিত লাভের পরিমাণের হার ক্রমাগত পতনের মধ্যে দিয়ে সংকট তৈরি হবে, তখন অবশ্যম্ভাবী ভাবে সমাজ বিপ্লব ত্বরান্বিত হবে, যার নেতৃত্বে থাকবে সর্বহারা শ্রেণী, এই প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্যবাদী সমাজ।

মার্কস উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তার পুঁজি গ্রন্থ রচনা করেন, যদিও সেই শতকে অনেকগুলো সহিংস শ্রমিক আন্দোলন সংঘটিত হয় কিন্তু পশ্চিম ইউরোপে পুঁজিবাদের পতন পরিলক্ষিত হয়নি। বরং বিংশ শতকের শুরুতে রাশিয়ায়, যা পুঁজিবাদ বিকাশের ধারায় অতটা অগ্রবর্তী ছিল না, সেখানে বলশেভিক দলের নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই ইতিহাস মার্কসবাদ এর ভবিষ্যৎ বাণী সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করে। এর আলোকে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজ চিন্তাবিদগণ পুঁজিবাদের টিকে থাকার ওপর তাঁদের মতামত ও তথ্য প্রদান করেন। এই নতুন তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানের তাত্তিক বিতর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়। এই এই ক্ষেত্রে ফ্রাঙ্কফূর্ট চিন্তা প্রতিষ্ঠানের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া কাঠামোবাদী মার্কসীয় চিন্তাবিদগণও গুরুত্বপূর্ন তত্ত্বসমূহ প্রদান করেন।

কাঠামোবাদী মার্কসবাদ প্রসঙ্গে দু'জন তাত্ত্বিকের আলোচনা করব: তারা হলেন আন্তোনিও গ্রামসি ও লুঁই ত্র্যালথুসার[৯]। কাঠামোবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করার পেছনে একটি যুক্তি আছে। ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামোবাদের সূত্রপাত ফার্দিনান্দ সসিওঁর বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে। যে কোন শব্দ একটি মূর্ত বা বিমূর্ত বাস্তবতাকে উপস্থাপন করে, তাই এটি একটি প্রতীক বা চিহ্ন। এই চিহ্ন নির্মিত হয় একটি প্রতীক ও তৎসংলগ্ন ভাবনাকে জোড়া দিয়ে। দু'টোর কোনটাই এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ন নয়। সুতরাং যে কোন কাঠামো তার অর্ন্তভক্ত উপাদানের সম্বন্বিত সম্পর্ক দিয়ে তৈরী হয়, একটি বাদ দিয়ে আরেকটি অর্থপূর্ন করা সম্ভব নয়, সতরাং এখানে একক আধিপত্যের কোন সুযোগ নেই। এই মতামতকে যদি আমরা মেনে নেই তাহলে উৎপাদন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও মতাদর্শকে এক সাথে করে সমাজ কাঠামোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। একই সূত্রে বলা যেতে পারে যে, মতাদর্শকেন্দ্রীক যে চেতনা তা নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণীর যে বিপ্লবী আকাংখা তাকে অবদমন করা যেতে পারে বা নিয়ন্ত্রন করা যেতে পারে। তাহলে চেতনার যে সেতুবন্ধন নির্মাণের ভূমিকা তাকে নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব। ব্যক্তির মনন-চিন্তা এবং তার সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে চেতনা, সেই চেতনাকে নিয়ন্ত্রনের মধ্যে দিয়ে মনন-ও চিন্তাকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে ধাবিত করা যেতে পারে। পশ্চিম ইউরোপের অগ্রগামী পুঁজিবাদী সমাজগুলোতে সর্বহারা শ্রেণীর মনন-চিন্তাও চেতনাকে প্রভাবিত করে নিয়ন্ত্রন করা যায়। গ্রামসি তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে পুঁজিবাদী বিশ্বের দীর্ঘজীবনের অর্ন্তনিহিত প্রেক্ষিতটি বুঝতে চেয়েছেন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে সম্পৃক্ত করে বা বুর্জোয়ার নির্বাচিত ভাবনা যেমন ভোগবাদকে সর্বহারার মনন ও চিন্তা'র মধ্যে প্রথিত করে স্থিতিশীলতার পক্ষে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। বুর্জোয়া ভাবনাকে যখন শান্তিপূর্ণ বা সমঝোতার মাধ্যমে সমাজে বিস্তৃত করা হয় এবং তার মাধ্যমে শ্রেণী বৈরিতার ওপর একটি আচ্ছাদন নির্মাণ করা হয় তখন শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব আকাংখাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা সম্ভব। যদি এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন পুঁজিবাদী সমাজের শাসকশ্রেণী বল প্রয়োগের মাধ্যমে পুঁজিবাদীকাঠামোকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

এ্যালথুসার বলেছেন মতাদর্শগত রাষ্ট্রীয় কৌশলের এবং নিপিড়নমূলক রাষ্ট্রীয় কৌশলের কথা, যা দিয়ে পুঁজিবাদী সমাজ তার তীব্র শ্রেণী বৈষম্য বা শোষণকে আচ্ছাদিত করে চলমান থাকতে পারে। পাঠ্যপুস্তক সমাজের মূল্যবোধ বা সমাজের প্রচলিত ভাবনা একটি শিশু ও কিশোরের মনন ও চেতনায় প্রবিষ্ট করে। শৈশবের সামাজিকীকরণের মধ্যে দিয়ে এই আচ্ছন্নকরন করা সম্ভব। সর্বহারা শ্রেণীর সন্তান-সন্ততি পুঁজিবাদী সমাজের আকর্ষণীয় বিষয় যেমন ভোগবাদ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, একইভাবে সম্পদ আহরণের আকাংখায় উদ্দীপিত হতে পারে। এখানেও বুর্জোয়া সমাজ চেতনাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, ফলে চেতনা আপেক্ষিক অর্থে সমাজ কাঠামোর প্রেক্ষিতে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। শ্রেণী অবস্থানগত কাংখিত চেতনা এবং সর্বহারার প্রকৃত চেতনার মধ্যে দূরত্ব নির্মিত হতে পারে , যা পুঁজিবাদী সমাজকে টিকে থাকার পক্ষে সহায়ক হতে পারে। এভাবে মতাদর্শ প্রভাবিত করার কৌশল যদি কাজে না লাগে, তবে নিপীড়নমূলক রাষ্ট্র কৌশল ব্যবহৃত হতে পারে প্রতিপক্ষের সম্মতি নিশ্চিতকরণে।

---

9. এখানে উপস্থাপিত আলোচনা নিম্নলিখিত দুটি গ্রন্থ ভিত্তিক করা হয়েছে:
Antonio Gramsci (1992), Selections From The Prison Notebooks, (eleventh printing), Lawrence Wishart: UK. (originally published in 1991). Louis Althusser (1993), Ideology and Ideological State Apparatuses, Verso: UK (originally published in 1990).

ফ্র্যান্কফুর্ট চিন্তা প্রতিষ্ঠান বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে আর্বিভূত হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান সমাজ চিন্তা সমূহকে পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজের চলমানতা বা টিকে থাকার অন্তর্নিহিত কারণের উপর আলোকপাত করে। হার্বার্ট মারকুজ গুরুত্ব দেন এক রৈখিক চিন্তার উপর। পুঁজিবাদ সফল ভাবে বহুরৈখিক চিন্তাকে,যার মধ্যে বিদ্রোহ নিহিত থাকতে পারে, একরৈখিক চিন্তায় পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়েছে[১০]। এই একরৈখিক করণ অনেকটাই সম্ভব হয়েছে ভোগবাদী সংস্কৃতি বিস্তৃত করণের মধ্যে দিয়ে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তির অবদানও গুরুত্বপূর্ণ।

তবে এই চিন্তা প্রতিষ্ঠানের একজন জুরগেন হ্যাবারমাস আরও গভীর বিশ্লেষণ করেছেন একটি সমাজে আন্তঃকাঠামোর চলমানতা বুঝতে, যা কিনা মার্কসবাদকে নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি করে[১১]। আধুনীক সমাজ নির্মাণের প্রক্রিয়ায় যুক্তিশীলতার বিস্তৃতি একটি বড় বিষয়। ভেবার এই যুক্তিশীলতাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন আধুনীক সমাজ নির্মাণের প্রশ্নে। ভেবার মানুষের সামাজিক কর্মকান্ডকে ব্যাখ্যা ও শ্রেণী বিভাজন করার সময় উদ্দেশ্যকেন্দ্রীক যুক্তিশীল কাজ, মূল্যবোধ কেন্দ্রীক যুক্তিশীল কাজ, গতানুগতিক কাজ এবং ভাবাবেগ প্রসূত কাজের কথা বলেছেন। উদ্দেশ্য কেন্দ্রীক যুক্তিশীলতা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীলতার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্যনীয়। আমরা বৈজ্ঞানিক ভাবে তখনই যুক্তিশীল যখন আমাদের কার্মের লক্ষ্য ও সেই লক্ষ্য পৌছাবার নির্বাচিত পথের মধ্যে বিরাজ করবে বোধগম্য সর্ম্পক। যেমন আকাশে মানুষের বিচরনের জন্য দরকার উড়োজাহাজ, কোনো কল্পিত বাহন নয়। সুতরাং এই উদ্দেশ্য কেন্দ্রীক যুক্তিশীলতা জ্ঞানের মর্যাদার কাঠামোয় অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু যুক্তিশীলতা বলতে শুধু আমরা উদ্দেশ্য ও সেই উদ্দেশ্যে পৌছানোর পথের সঠিককতাকেই বুঝাবো? আমর যখন কথাবার্তা বলি তখন আমাদের মাঝে যে সমঝোতা বা বোঝাপড়া তৈরী হয়, সেটি কে কি আমাদের যৌক্তিক মনে হয় না? একজন দুঃস্থ লোকের প্রতি কারও সমবেদনা তৈরী হয়, তাকে কি আমাদের যৌক্তিক আচরন বলে মনে হয় না? তাহলে তো আমাদের এই প্রাত্যহিক জীবনের পরতে পরতে যুক্তির আলাপচারীতা ছড়িয়ে আছে। আমরা যুক্তিশীলতা ব্যাখায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে থাকি। কার্যকরন সম্পর্ক বিশ্লেষনে আমরা বৈজ্ঞানীক যুক্তির শরনাপন্ন হই আর অন্যান্য আচরণের ক্ষেত্রে অন্য ধরনের যুক্তিশীলতার কথা বলে থাকি। তাহলে যুক্তিশীলতার সাথে সমঝোতা বা একমত হওয়ার একটা বিষয় জড়িয়ে আছে। বক্তব্য প্রদানকারী ও বক্তব্য শ্রবণকারীর মধ্যে যদি সমঝোতা বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে একটি বক্তব্যের যৌক্তিক হয়ে উঠা দুষ্কর হয়। এই দৃষ্টি কোণের আলোকে হ্যাবারম্যাস আমাদের সাধারন জীবন এবং অর্থনীতি ও রাজনীতির সমন্বয়ে গড়ে উঠা কাঠামোবদ্ধ জীবনকে বিশ্লেষন করেছেন। আমাদের ভাষাকেন্দ্রিক সাধারণ জীবনে ঐক্যমতের ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালিত হয় যা যুক্তিশীলতার দৃষ্টিকোন থেকে গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়ায় চলমান। কিন্তু সাধারণজীবন থেকে অর্থনীতি ও রাজনীতি বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন অবস্থার সৃষ্টি করেছে। অর্থ্যাৎ কৌম সমাজে সমস্ত কর্মকান্ডে একসাথে গ্রথিত থাকার পর তা ক্রমাগতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অর্থনীতি ও রাজনীতি ভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন দ্বারা পরিচালিত হয়েছে এবং নতুন

---

10. Herbert Marcuse (2002), One Dimensional Man, Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, Routledge: London & New York (originally published in 1964).
11. Jurgen Habermas (1984), The Theory of Communicative Action, Reason And The Rationalization of Society, Vol-1. Beacon Press: USA. (originally published in 1981).
    ঐ (1987) The Theory of Communicative Action, Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason, Vol-2, Beacon Press: USA. (originally published in 1981).

মাধ্যমের সৃষ্টি হয়েছে সমাজে,যা হলো অর্থ বা টাকা পয়সা এবং ক্ষমতা। আমাদের একাধিক কার্জকর্ম শুধু অর্থ ও ক্ষমতাকে ঘিরে হয় না। আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ চালিত করার জন্য অর্থ ও ক্ষমতা একছত্র আধিপত্য লাভ করেছে। কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক নির্মিত হয়েছে চমৎকার বোঝাপড়া দিয়ে, ভাষা ব্যবহার যা অন্যতম উদাহরন। আমরা এক সাথে চলতে পারি বা কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারি এই সমঝোতা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। কিন্তু অর্থ ও ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে যেসব কর্মকান্ড পরিচালিত হয়, তা কি একই মানদন্ডে নিরুপিত হয়? আমরা কি আমাদের স্বার্থতাড়িত কাজ বা আধিপত্য বিস্তারের যে কাজগুলো করি, যেখানে আমরা সুক্ষ্ম বিশ্লেষন করে আগাই, লক্ষ্য পৌঁছাতে যাতে ভুল না হয়। সে ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করি, সেখানে কি আমরা সমঝোতা নির্মানের ধার ধারি? কিন্তু যদি ধার না ধারি তাহলে তো বনিবনা হওয়াই দুষ্কর হয়ে উঠবে? কিন্তু সমাজ জীবন তো সমঝোতা ছাড়া টেকা সম্ভব নয়। হ্যাবারমাস মনে করেন আমরা প্রতিনিয়ত বোঝাপড়ার কাজ করে চলেছি। আধুনীক জীবন যেমন অর্থ ও ক্ষমতা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে তেমনি নতুন ক্ষেত্র নির্মান করেছে যেখানে প্রতিনিয়ত তর্ক বিতর্ক হচ্ছে যুক্তিশীল সমঝোতায় পৌঁছানোর। সেটি খবরের কাগজ থেকে শুরু করে উন্মুক্ত বক্তৃতা সব জায়গাতেই আমরা তা করে চলেছি এবং জনমত তার একটি বড় প্রতিফলন, তাহলে বুর্জোয়া সমাজকেও এই জনমতের সাথেও বোঝাপড়া করতে হবে সব ধরণের অসংগতিকে সহনীয় করে তোলার ক্ষেত্রে।

সমাজবিজ্ঞানের ধ্রুপদী পর্যায়ে অন্যতম তাত্ত্বিক এমিল ডুর্খিম ও ম্যাকস্ ভেবার। গোল্ডনার দৃষ্টবাদী সমাজবিজ্ঞান ও ধ্রুপদী পর্বের তত্ত্ব সমষ্টিকে পাঠ্যক্রম ভিত্তিক সমাজবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু অভিহিত করেছেন। সমাজ বিভাজিত না সমাজ আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে দিয়ে সমন্বিত, এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ শুরু থেকেই এবং তর্ক বিতর্কের একটি অন্যতম বিষয়। ক্রিয়াবাদ ও দৃষ্টবাদের সমন্বয়ে জোড়ালো যুক্তি দাড় করানো হয় সমাজের আন্তঃনির্ভরশীলতা, স্থিতিশীলতা সহ একটি ভারসাম্য যুক্ত সমষ্টি হিসেবে সমাজকে পরিচিত করে তুলতে। ডুর্খিম ইতিহাসের দিকে তাকান কিন্তু ভিন্ন উপসংহারে পৌঁছান[১২]। তিনি কৌম সমাজে দেখতে পান শক্ত বাঁধন, কেননা সেখানে সবার চিন্তার বা দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বড় ধরনের সাদৃশ্য রয়েছে। সামাজিক চেতনা প্রবলভাবে বিরাজমান প্রাথমিক পর্যায়ের কৌম সমাজে। তিনি নাম দিলেন যান্ত্রিক সংহতি। কর্মকান্ডের দিক থেকে সমাজ বিভাজিত নয়। সামাজিক চেতনার সাদৃশ্যের বদৌলতে সমাজের বাঁধন বা সংহতি শক্ত। এটি কৃষিভিত্তিক সমাজের জন্যও প্রযোজ্য। কাজ ভিত্তিক শ্রম বিভাজন খুবই সীমিত। এদিকে ধর্ম একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে সমজাতীয় চেতনা ভিত্তিক সংহতি নির্মাণে। ডুর্খিম সরল সমাজ থেকে জটিল সমাজের যে রূপান্তর, তা ব্যাখ্যা করেছেন জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধির একটি ফলাফল হিসেবে। মানুষের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ফলে শ্রম বিভাজন এসেছিল। এই শ্রম বিভাজনে কাজের সুযোগ বেড়ে গিয়েছিল এবং সমাজে ভালো একটা কিছু হলো, সুতরাং নৈতিক ঘনত্ব বেড়েছিল। ডুর্খিম সমাজকে মনে করেন নৈতিকতা অর্থে ভালোর প্রতীক। সমাজ অন্তর্নিহিতভাবে পবিত্রতার স্মারক। শ্রম বিভাজনের ফলে অনেক নতুন প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত, এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যেকার সম্পর্ক যেন জৈবিক সূত্রে গ্রথিত, তাই জৈবিক সংহতি। এই সমাজের বাস্তব উদাহরণ হল শিল্পায়িত সমাজ। ফরাসি বিপ্লবের পর শিল্পায়িত সমাজে নতুন মূল্যবোধ যুক্ত হয়, তা হল ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তি স্বাধীনতা। প্রশ্ন হল ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাপ্তি কতটা হবে? এতটাই কি ব্যাপ্তি হবে যেখানে অভিন্ন কোন দৃষ্টিভঙ্গি বা ন্যায়বোধ থাকবেনা? এমনিতেই গতানুগতিক সমাজ

12. Emile Durkheim (1994), The Division of Labour in Society, Macmillan: Printed in China. (Macmillan edition was first published in 1986).

পরিবর্তনের ফলে একটি নৈতিক শূন্যতা তৈরি হয়েছে। আর নৈতিক শূন্যতা সামাজিক সংকট নির্মাণ করে যা এক সময়ে বিশৃঙ্খলায় পরিণত হয়। সামাজিক স্থিতিশীলতার বিঘ্ন ঘটে এই প্রক্রিয়ায়। ডুর্খিম এক্ষেত্রে ন্যায় বিচার বা ভালো-মন্দ যাচাই করার সংস্কৃতির ওপর জোর দিলেন। অর্থাৎ সমাজে একসাথে থাকতে গেলে ভালো-মন্দের একটি মানদন্ড থাকতে হবে না হলে তৈরি হবে এক ধরণের নৈরাজ্য। সমাজের আন্ত-নির্ভরশীলতা চূড়ান্ত অর্থে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয়, দরকার নৈতিক মানদন্ডের। এভাবেই ডুর্খিম সমাজের নতুন সংজ্ঞা দিলেন,এবং সব কিছু ব্যাখ্যা করলেন চাহিদার বা প্রয়োজনের নিরিখে, এভাবে আমরা দেখতে পাই ক্রিয়াবাদ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহার।

ধ্রুপদী পর্বের আরেকটি বিশিষ্ট নাম ম্যাকস্ ভেবার[১৩]। তর্ক-বিতর্কের তিনটি সূত্র তার বিশ্লেষণে দেখতে পাই। প্রথমটি হল সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতির যে স্বাতন্ত্র তা তুলে ধরা, দ্বিতীয়ত: সমাজ কি তা বিশ্লেষণে ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেয়া সামষ্টিক সমাজের চাইতে, তৃতীয়ত: সমাজ পরিবর্তনের ব্যাখ্যায় সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেয়া। প্রথম বিষয়টি ইতিমধ্যে কিছুটা বিশ্লেষিত হয়েছে এবং শেষের দিকে আরো কিছুটা নজর দেয়া হবে। দ্বিতীয় বিষয়টিও আরো কিছুটা পর দৃষ্টি দেয়া হবে। ইউরোপের গতানুগতিক সমাজ যা খ্রিস্টধর্ম কর্তৃক জোরালো ভাবে প্রভাবিত ছিল, একসময় উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিবর্তিত হয়। নতুন সমাজ আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ। এই নতুন সমাজে মানুষের আচরণ যুক্তিশীল হয়েছে এই মর্মে যে তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি মনোযোগী সঠিক পথ বেঁছে নেয়ার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ বিজ্ঞানভিত্তিক কার্যকরণ সম্পর্কের আলোকে যে যুক্তিশীলতা তা হলো যুক্তিশীলতার মানদন্ড, এতে করে মানুষের অন্যান্য আচরণ সমূহ যেমন মূল্যবোধ তাড়িত বা আবেগ প্রসূত তার গুরুত্ব অনেকটাই প্রান্তিক হয়ে গেলো। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খ্রিস্টীয় ধর্মে প্রোটেস্ট্যান্ট ধারার আবির্ভাব। এই ধারা প্রাচীন ক্যাথলিক ধারা থেকে আলাদা। এ ধারায় পরলোকের পাশাপাশি ইহলোককেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ শুধু প্রার্থনা থেকে আসবেনা, ইহলোকের সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমেও সৃষ্টিকর্তার আনুকূল্য ও আশীর্বাদ পাওয়া যাওয়ার কথা এই নতুন ধারায় বলা হয়েছে। এই নতুন মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মানদন্ড পুঁজিবাদের চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ হয়ে আবির্ভূত হল। পুঁজিবাদী কর্মকান্ড এক ধরনের নৈতিক গ্রহণযোগ্যতা পেলো। এই ধরনের ব্যাখ্যায় ইউরোপীয় ভাববাদের কিছুটা হলেও প্রতিফলন দেখা যায়। মানুষ যখন নৈতিক বলে অনুপ্রাণিত হয় তখন আবেগাশ্রিত হয়ে কাজটি সে করে, তার উদ্দীপনা তো থাকেই আরো ধর্মের অনুমতি থাকাতে তা আরও বেগবান হয়। আমরা সহজেই বস্তুবাদী বিশ্লেষণ থেকে এই ধরনের বিশ্লেষণের পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারি।

গোল্ডনার চতুর্থ পর্ব হিসেবে দেখিয়েছেন ক্রিয়াবাদী কাঠামোবাদ। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পারসন্স এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সমাজের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো রচনা করেছেন[১৪], ক্রিয়াবাদের প্রধান যে সমস্ত ধারণা তা সবই এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং তৎকালীন মার্কিন সমাজে এই তত্ত্বের প্রাঙ্গিকতাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন গোল্ডনার। ক্রিয়াবাদ

---

13. Max Weber (1947), The Theory of Social and Economic Organization, Free Press; USA
    ঐ (1992) The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism, Routledge: USA. (originally published in 1930).
14. Talcott Parsons (1940), The Structure of Social Action, Free Press: USA. (originally published in 1937).
    ঐ (1991) The Social System, Routledge: UK. (originally published in 1951).

সমাজবিজ্ঞানে সূচিত হলেও নৃবিজ্ঞান শাস্ত্রে এর বিশেষ বিকাশ ঘটে বিশেষ করে র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন ও ম্যালিনাওস্কীর হাতে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাঠামোবাদী ক্রিয়াবাদ এর আগে মিথষ্ক্রিয়াবাদের বিশেষ বিকাশ ঘটে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগকে কেন্দ্র করে। ইউরোপে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশের ধারায় সমাজের কাঠামোগত চরিত্র বা সমাজের প্রভাব সৃষ্টি করার প্রভূত ক্ষমতার ওপর বিস্তর লেখা হয়েছে, সেই তুলনায় ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি তুলনামূলকভাবে কম মনোযোগ পেয়েছে। ব্যক্তি সমাজকে তার মত করে গ্রহণ করার চেষ্টা করে এবং বাস্তবতার আলোকে সে তার কর্মপন্থা নির্ধারণ করে- এই বক্তব্য মিথষ্ক্রিয়া বাদের সাথে সংগতিপূর্ণ। সমাজের নীতিমালা নিজ থেকে বাস্তবায়িত হয় না বরং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে মিথষ্ক্রিয়া হয় সেই বাস্তবতায় সমাজের নীতিমালা টিকে থাকে। প্রতি মহূর্তে সমাজ পূনর্নির্মিত হয় হুবুহু একইভাবে নয়, বরং বিরাজমান বাস্তবতার আলোকে, যেখানে ব্যক্তির সৃষ্টিশীলতার অভিনবত্ব ইর্ষনীয়। যদি সহজে বলি, অকারণের মধ্যে কারণ খুঁজে ফেরার যে ক্ষমতা তা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ, সে সমাজের হাতে নিয়ন্ত্রিত কোন যন্ত্র নয়। সমাজকাঠামো-বাস্তবতা-ব্যক্তি এই তিন উপাদানের সমন্বয়ে যে প্রেক্ষিত নির্মিত হয়, তাই নির্ধারন করে সমাজের চলমানতা। ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা আছে, যা উপযোগিতা তত্ত্বে বলা হয়েছে। হোমান্সের বিনিময় তত্ত্ব মানুষের একান্ত চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং আচরণবাদের আলোকে মানুষের কর্মকান্ড ও সামাজিক সম্পর্ক বুঝতে চেয়েছে। বিনিময় তত্ত্ব সমালোচিত হয়েছে পরবর্তীতে এই মর্মে যে এখানে সমাজ কর্তৃক যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় যা ব্যক্তির ইচ্ছাকে উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রভাবিত করে, তা উপেক্ষিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে যৌক্তিক পছন্দের তত্ত্ব উল্লেখ্য। প্রতীকি মিথষ্ক্রিয়াবাদ আরও বিস্তৃতভাবে ব্যক্তি ও সমাজের যৌথ মিথষ্ক্রিয়ায় ব্যক্তিস্বত্তা নির্মিত হয়, তা বিশ্লেষণ করেছে। তবে ঝোঁকটা হচ্ছে এমন যে, সমাজ টিকে থাকছে ব্যক্তির পরিসীমায়, সুতরাং চূড়ান্ত বাস্তবতা হলো ব্যক্তি। আমরা ব্যক্তির আয়নায় সমাজকে দেখি। ব্যক্তিত্ব নির্মাণে সামাজিক প্রেক্ষিত একান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু শেষ ফলাফল ব্যক্তির স্বত্তা ও ব্যক্তিত্ব।

পারসন্স ১৯৩৭ সালে সামাজিক কর্মকান্ডের কাঠামো সংক্রান্ত পুস্তকটি রচনা করেন। এই গ্রন্থের প্রধান বিষয়টি ছিল, একজন ব্যক্তি কি প্রক্রিয়ায় তার একটি কাজ বেছে নেয় এবং তা সম্পন্ন করে। বলা প্রয়োজন যে পারসন্স তার এই তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে একাধিক বিরাজমান তত্ত্বের সমাহার ঘটাননি শুধু, সমাজবিজ্ঞানের দেখার যে স্বকীয়তা তা চিহ্নিত করেছেন। একদিকে অর্থনীতির উপযোগিতাবাদ, অন্যদিকে সমাজের সাংস্কৃতিক কাঠামো এই দুইয়ের সমন্বয় করে দেখিয়েছেন যে ব্যক্তি নিজস্ব চাহিদা কখনোই স্বেচ্ছাচারিতা হতে পারে না। সমাজের যে ভালো মন্দের ধারণা তার সাথে একটা বোঝাপড়া করতেই হয়। ব্যক্তি তার অন্তর্গত প্রেরণার ফলশ্রুতিতে উদ্যোগী হয় একটি উদ্দেশ্য সাধনে। আধুনিক যুক্তিশীলতা অনুসারে সে সবচাইতে সঠিক পথটি বেছে নেয় লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য। নির্বাচিত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নিজস্ব স্বার্থ তাড়িত হবে, কেননা ব্যক্তি সেই কাজটি করতে চায় যাতে তার ব্যক্তিগত লাভ সবচাইতে বেশি হতে পারে। ঠিক এই জায়গাতেই পারসন্স আঙ্গুল তুললেন। তিনি বললেন মানুষের চাওয়া পাওয়ার যে চেতনা তৈরি হয় তা তো সমাজের মধ্যে বসবাসরত অবস্থাতেই হয়। তাহলে সমাজের ভালো-মন্দের ধারণা থেকে সে নিজেকে কিভাবে সরিয়ে রাখতে পারে? ডুর্খিমের কথার সূত্র ধরে যদি আমরা বলি যে সমাজ একটি নৈতিক সমষ্টিও বটে। অর্থাৎ ভালো খারাপের ধারণা বিহীন মানুষ একত্রিত হতে পারবে না, তখন ব্যক্তির স্বার্থ তাড়না আকাশচুম্বী হওয়াটা একটি কঠিন বিষয়। ব্যক্তির উদ্যম, উদ্যোগ বা ইচ্ছাকে কোনভাবেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। কিন্তু তা কোন শূন্যতার মধ্যে ঘটে না, একটা সামাজিক বেষ্টনীর মধ্যেই সংঘটিত হয়। পারসন্স যখন ব্যক্তিভিত্তিক সামাজিক কর্মকান্ডের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করছিলেন, তখনই তাকে সমাজে বিদ্যমান একাধিক প্রতিষ্ঠান যেমন বিবিধ পেশা,

সেগুলির মর্যাদা, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত ইত্যাদিকে সঠিক গুরুত্ব দিয়ে তত্ত্বটিকে গ্রহণযোগ্য করতে হয়েছে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে যে পারস্পরিকতা থাকে তা দিয়ে সমাজের স্থিতিশীলতাসহ ভারসাম্য রচিত হয়। কিন্তু ব্যক্তি ও তার ব্যক্তিত্ব, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি সমন্বয়ে যে সমাজব্যবস্থা সেটির বাস্তবতা আরো বিস্তৃত এবং জটিল। সুতরাং একই শতাব্দীর ৫০ এর দশকে তিনি রচনা করলেন পূর্ণাঙ্গ সমাজব্যবস্থার ওপর তাঁর গ্রন্থ। কাঠামোবাদি ক্রিয়াবাদ একটা সম্পূর্ণতা অর্জন করল। এই সমাজ ব্যবস্থা অন্তর্গত ভাবে ভারসাম্য যুক্ত, তাই যখনই কোন ঝুঁকি তৈরি হয়, এই ব্যবস্থা তা মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। যেমন নতুন প্রতিষ্ঠান, এখানে জীবিত মানুষ যেমন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, একই সাথে বিমূর্ত সংস্কৃতি, অর্থনীতি বা রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমান্বয়ে মানুষের কর্মকান্ড কতগুলো সুনির্দিষ্ট ধরনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং সমাজ ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত কতগুলো প্রয়োজনকে নিশ্চিত করে, যেমন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো, নির্বাচিত উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়ন, সমাজের বাঁধন ধরে রাখা বা সমাজ কি প্রণালীতে সক্রিয় থাকবে তা নির্দেশ করা। সমাজতত্ত্বের বিপ্লবী ধারার যারা অনুসারী তাদের দৃষ্টিতে পারসন্স এর বিশ্লেষণ পুঁজিবাদী সমাজের স্বপক্ষের মতাদর্শগত বয়ান। তিনি যে সর্বজনীন প্রকরণ প্রবর্তন করেছেন, যেমন অর্জন ভিত্তিক সমাজ বনাম আরোপিত বিভাজন ভিত্তিক সমাজ, তাতে সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণী দ্বন্ব বা রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্ব থেকে উৎসারিত সামাজিক ঘটনাবলী গৌণ মনোযোগ পেয়েছে বা পাইনি একেবারে। সুতরাং উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বন্ব ভিত্তিক সামাজিক বিষয়গুলি প্রান্তিক মনোযোগ প্রাপ্ত হয়েছে। তাই সমাজতত্ত্বে রক্ষণশীল এবং বিপ্লবী ধারা সমান্তরাল ভাবেই চলমান।

ধ্রুপদী সমাজবিজ্ঞানের আমল থেকেই ব্যক্তি কেন্দ্রিক আলোচনা ও সমষ্টি কেন্দ্রিক আলোচনা চালু আছে। এই তর্কটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল অনেক কারণে। ব্যক্তি কতটা স্বয়ম্ভু, এই প্রশ্নটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের প্রচারক যারা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র তত্ত্বের চূড়ান্ত রূপে সমাজকে একটি নিছক কল্পনা বলে দাবি করা যায়, দৃশ্যমান হলো জৈবিক ব্যক্তি। এই ব্যক্তির অনুভূতি, আকাংখা, উদ্যম ইত্যাদি দৃশ্যমান। সমাজ দৃশ্যমান নয় সেই অর্থে। ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছাই মূলত সমাজের ইচ্ছা অনিচ্ছা। এর উল্টো ভাবনায় সমাজকে প্রচন্ড শক্তিশালী একটি প্রতিষ্ঠান মনে করা হয়। যদিও ব্যক্তি সমষ্টির সমন্বয়ে সমাজ কিন্তু চরিত্রগতভাবে এটি আলাদা। রসায়ন শাস্ত্রে এই ধরনের অনেক উদাহরণ আছে, দুটি মৌলিক গ্যাস মিলিত হয়ে যে যৌগিক গ্যাস তৈরি করে তার গুণাবলি সম্পূর্ণ আলাদা হয়, যদি এক একটি মৌলিক গ্যাসের সাথে তুলনা করা হয। সামাজিকীকরণ একটি বড় উদাহরণ সমাজের ক্ষমতাকে বোঝানোর জন্য। সুতরাং তাত্ত্বিকভাবে এই বিষয়টি একটি বড় ধরনের অমীমাংসিত বিতর্ক। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এ্যান্থনী গিডেন্স এই বিতর্কের একটি সুরাহা করতে চাইলেন[১৫]। তিনি ব্যক্তি অন্তর্নিহিত উদ্যমকে সামনে নিয়ে আসলেন। এই উদ্যম ব্যক্তির যে শক্তি তার বহিঃপ্রকাশ। একজন ব্যক্তি অন্ধের মত চলেনা। সে তার পছন্দ-অপছন্দ,ইচ্ছা অনিচ্ছাকে তার কাজের মধ্যে প্রতিফলন ঘটায়। অবশ্যই সমাজের রীতিনীতিকে আমলে নিয়েই তার বিচরণ, কিন্তু তাকে পুতুলের সাথে তুলনা করা চলে না, তার নিজস্ব চলার কোন ক্ষমতা নেই। ব্যক্তি আছে বলেই সমাজের রীতিনীতির বাস্তবায়ন আছে আবার ব্যক্তি তার বাইরের সমাজের ভালো -মন্দকে আমলে নিয়েই চলতে অভ্যস্ত। তিনি কাঠামোবাদী এবং মিথস্ক্রিয়াবাদি বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীদের মধ্যে একটি ভারসাম্য নির্মাণের চেষ্টা করেছেন বলা যায়। তত্ত্বে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বাহন হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই দৃষ্টি ভঙ্গি বস্তুবাদী চেতনা থেকে আলাদা। অর্থনৈতিক ক্ষমতার উৎস সম্পদ আর রাজনৈতিক ক্ষমতার

15. Anthony Giddens (1984), The Constitution of Society, Polity Press: UK.

উৎস বৈধ কর্তৃত্ব। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি এই সম্পদকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। সমাজ প্রতিদিন নবায়নের বা পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে চলমান থাকে, আর সেই নবায়নের কাজটি সম্পাদিত হয় ব্যক্তি কর্তৃক। সমাজের মতাদর্শ সহ প্রতীক বরাদ্দকারী প্রতিষ্ঠান অর্থপূর্ন কি তা ধরিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখে। যেমন ধর্ম তার মতো করে অর্থপূর্ন কাজের তালিকা প্রদান করে, রাজনৈতিক মতাদর্শ কাংখিত সমাজের অর্থ নির্মাণ করে। আর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানদের কাজগুলো সম্পন্ন করার প্রাসংগিক সহায়তা। সমাজে যে আধিপত্য তৈরি হয়, তাকেও অর্থপুর্ণ ভাবেই পরিচালিত হতে হয়। অর্থাৎ আধিপত্য যদি অর্থপুর্ণ ও বৈধ না হয় তবে তা দীর্ঘায়িত হয় না। সুতরাং সমাজের নীতিমালাগুলো বিমুর্ত সহায়ক হিসেবে ক্রিয়াশীল আর বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় তা রুপান্তরিত হয় প্রকৃত সমাজ বাস্তবতায়, তা কখনও প্রাথমিক মুখোমুখি সম্পর্কে, কখনও বা অদৃশ্য বন্ধনের মধ্যে দিয়ে, যা থেকে তৈরি সামাজিক সংহতি বা বন্ধন এবং সমাজ ব্যবস্থা কেন্দ্রীক সংহতি বা বন্ধন।

দৃষ্টবাদী সমাজবিজ্ঞানকে নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে আরও জোরালো ভাবে[১৬]। ফ্রাঙ্কফূট চিন্তা প্রতিষ্ঠান বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সমাজ বিশ্লেষণে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে অবিকল ব্যবহার নিয়ে সংশয় প্রকাশ ও সমালোচনা দুটোই করেছিল। মানুষের আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্ককে কি প্রাকৃতিক বস্তুর সাথে তুলনা করা চলে, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। পর্যবেক্ষণ না ব্যাখ্যা, এই দ্বৈত্বতার জটিলতাকে মাথায় রেখে অনেকেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি সমাজ বিশ্লেষণে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক হতে বলেছেন। আমরা ইন্দ্রিয় উপলব্ধি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করি বটে, কিন্তু তারপর যে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা হয়, তার নামকরণ করা হয় অনেক সময় নৈতিক অর্থে যা সমাজবিজ্ঞানকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে আলাদা করে তোলে। যেমন সামাজিক বৈষম্য কি একটি নিরপেক্ষ নামকরণ না নৈতিক ভাবনায় অনুপ্রাণিত নামকরণ তা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। সমাজে সমাজে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা এবং সমাজ পরিবর্তনে ইতিহাসের প্রভাব সমাজবিজ্ঞান ভাবনার মধ্যে আপেক্ষিকতা যুক্ত করেছে, অর্থাৎ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্বাস যদি এক সমাজ থেকে আরেক সমাজে আলাদা হয় তাহলে একই তত্ত্ব কি সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে? যেমন: বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের ধারণা আর পাশ্চাত্যের নারীর ক্ষমতায়নের ধারনা কি একই হবে? একইভাবে আধুনিকতার ধারণা পাশ্চাত্যে যা প্রচলিত তা কি দক্ষিন এশীয় সমাজের জন্য একই থাকবে? না এখানকার স্থানীয় সংস্কৃতি তা ভিন্নভাবে উপস্থাপিত করবে? এই জাতীয় প্রশ্ন সমাজবিজ্ঞানের সর্বজনীন তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করেছে, যেমন আঞ্চলিকতার সংস্কৃতি বাংলাদেশের শ্রেণিভিত্তিক রাজনীতিকে বিভিন্ন সময়ে প্রভাবিত করেছে।। একই ভাবে ঐতিহাসিক ভিন্নতাও সমাজতত্ত্ব প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা ইংগিত করেছে। এ সমস্ত কারণে উত্তর দৃষ্টবাদের কথা বলা হয়েছে , যেখানে বাস্তবতা যাচাই চলবে কিন্ত পর্যবেক্ষকের মনন, সংস্কৃতির ভিন্নতা বা ঐতিহাসিক বাস্তবতার ভিন্নতাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত সর্বশেষ বিতর্ক উত্তর আধুনিকতা প্রসঙ্গ। সমাজবিজ্ঞানেও উত্তর আধুনিকতার বিতর্ক অনেকটা গুরুত্ব লাভ করেছে। যে কোন তত্ত্বের সর্বজনীনতার দাবী প্রশ্নবিদ্ধ করেছে উত্তর আধুনিক চিন্তা। এই মতবাদ প্রবর্তন করেছে বহুত্ববাদের চিন্তা। ফরাসী দু'জন চিন্তাবিদ দেরিদা এবং লিঁওতার নাম এখানে উল্লেখযোগ্য, যাঁরা কাঠামোবাদকে এবং মহাআখ্যানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, এবং তাঁদের মতামত উত্তর আধুনিক তত্ত্বের চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে[১৭]। ভাষাতত্ত্বের কাঠামোবাদ বাক্যের কাঠামোর মধ্যে অর্থের অনুসন্ধান করেছে।

16. Morrow এবং Brown (1994), প্রাগুক্ত
17. Jacques Derrida (1981) Dissemination, The Athlone Press: USA. (originally published in 1972); Jean-Francois Lyotard (1984), The Post Modern

একটি শব্দ একই সাথে একটি প্রতীক এবং তা নির্মিত হয় নির্মাতার ইচ্ছা অনুযায়ী। এভাবে অভিধানের অন্তর্গত শব্দাবলী বিভিন্ন অর্থের প্রতীক রূপ হিসেবে স্বীকৃত। এভাবে নির্মিত প্রতীক সমূহ নিয়ে নিয়মসিদ্ধ বাক্য গঠনের মধ্যে দিয়ে ভাষা কাজ করে যা প্রাত্যহিক ভাব আদান প্রদানের একটি অন্যতম মাধ্যম। দেরিদা দেখালেন যে ভাব বা অর্থ একটি বাক্যে যতটা প্রকাশিত অনেকটাই অপ্রকাশিত। যেমন কোন বিষয়ে মতদ্বৈততা, প্রকারান্তরে প্রাথমিক মতের প্রয়োগকে স্থগিত করে দেয়। আবার অক্ষরমালার মধ্যে এই অপ্রকাশ্যের বিষয়টিও নির্দেশনযোগ্য। আমরা যখন 'ক' অক্ষরটি ব্যবহার করছি তার সাথে অপ্রকাশিতভাবে 'খ' উপস্থিত আছে। দার্শনিকভাবে বললে অনুপস্থিতিটির উপস্থিতির সন্ধান বা উল্টটা। তাহলে কাঠামোর মাঝে যতটা উপস্থিতি ততটাই অনুপস্থিতি। সুতরাং অনুপস্থিতির কার্যকারিতার স্বীকৃতি কাঠামোবাদকে দুর্বল করে দেয় এবং উত্তর আধুনিকতার একটি তাত্ত্বিক প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। যেমন দীর্ঘদিন ধরে একজন ব্যক্তির পরিচয় বর্ণণায় তার নিজের নাম ছাড়া শুধূ পিতার নাম অন্তর্ভুক্ত করাটাকে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার অনুপস্থিত প্রভাবের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিতর্কের সারমর্মকে অনেক সময় কাঠামো বনাম ব্যাখ্যার প্রতিযোগীতা হিসেবেও দেখা যায়। সমাজবিজ্ঞানী গিডেন্স অনুপস্থিতির মতামতকে গ্রহণ করলেও, ব্যাখ্যাই চুড়ান্ত অর্থ নির্মাণ করে বা অর্থের নিজস্ব কোন ভান্ডার নেই, এমনটা মেনে নিতে নারাজ এবং ব্যাখ্যা নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি দৃশ্যমান সামাজিক প্রেক্ষিত এর প্রসঙ্গ টানলেন। তার মানে ব্যক্তির মননে যেমন ব্যাখ্যা নির্মিত হয়, তা অর্থবহ করতে প্রয়োজন দৃশ্যমান সমাজ প্রেক্ষিত। অনুপস্থিতি বা ব্যাখ্যা এই জাতীয় বিষয়কে যদি কোন তত্ত্বের অর্থ অনুধাবনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয় তবে এমন প্রশ্ন অমূলক নয় যে, এতদিন ইতিহাস যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার পাল্টা ব্যাখ্যা নির্মাণ করা সম্ভব এবং সেইভাবে সমাজতত্ত্বের ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়াটাও সম্ভব।

সমসাময়িক সমাজের সার্বিক জ্ঞান-চর্চার পর্যালোচনা করে লিওতা তাঁর উত্তর আধুনিক বিষয়ক তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। আধুনিক সমাজ জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ বলেও পরিচিত। মানুষ তার যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করতে কায়িক শ্রম যুক্ত করে, জড় বস্তুর সমাগম ঘটায়, প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগায়, এতোসব করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তার চিন্তা, মনন, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি। জ্ঞান-চর্চা সব যুগেই পরিলক্ষিত, কিন্তু এর প্রকারভেদ আছে এবং দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে। আমরা কিভাবে আমাদের জীবনকে, সমাজকে, বিশ্বব্রম্মান্ডকে ব্যাখ্যা করি তাকে ঘিরে তৈরি হয় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। প্রাচীনকালে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল, পরবর্তীতে তা বিমূর্ত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রুপান্তরিত হয়েছে এবং আরও পরে বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্বের মাত্রায় ছাড়িয়ে গেছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তিশীলতাকে প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে। আবার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুমান শক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে পরম জ্ঞানের ধারনার জন্ম দিয়েছে এবং দেখাতে চেয়েছে যে যাবতীয় জ্ঞান-চর্চা কোন না কোন ভাবে এই পরম জ্ঞান হতে উৎসারিত। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যেমন প্রতিযোগিতা আছে একই ভাবে বিতর্কও বিদ্যমান। একেকটি দৃষ্টিভঙ্গিকে যদি আমরা একটি পূর্নাঙ্গ বর্ণনা বলে অভিহিত করি তাহলে আমাদের জ্ঞান জগৎ নির্মীত হয়েছে বিবিধ বর্ণনার সমন্বয়ে। আমাদের জীবন, সমাজ বা জগৎ নিয়ে যেমন, আছে ধর্মীয় বর্ণনা, তেমনি আছে বিজ্ঞান

Condition: A Report on Knowledge, Minnesota Press: USA. (originally published in 1979); Ben Agger (1991), 'Critical Theory, Post Structuralism, Post Modernism: Their Sociological Relevance', *Annual Review of Sociology*, Vol. 17; Michele Lamont (1987), 'How to Become a Dominant French Philosopher: The Case of Jacques Derrida', *American Journal of Sociology*, Vol 93, No. 3.

ভিত্তিক বর্ণনা। আবার প্রতিটি বর্ণনার একটি মৌলিক ধারনা আছে, যাকে ভিত্তি করে আমরা ব্যবহারিক বর্ণনা নির্মান করি। যেমন প্রগতির ধারনা একটি মৌলিক ধারনা যার মাধ্যমে আমরা বিগত শতাব্দীর বিবিধ ঘটনাবলীকে একত্রিত করে একটি অভিন্ন ইতিহাস রচনা করেছি। যদি দেখানো যায় যাকে আমরা প্রগতি বলে ধারনা করছি, তা মূলত প্রগতি তো নয়ই বরং উল্টো কোন কিছু হবে, তখন মৌলিক ধারনার প্রত্যয়টি দুর্বল বা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। যেমন বিংশ শতাব্দীর বিশ্বযুদ্ধ মানুষের চেতনার প্রগতির দাবীকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। আবার একেকটি বর্ণনার একটি অভিন্ন কাঠামো আছে। এখানে একজন বক্তা ও একজন শ্রোতা। যে কোনো বর্ণনার গ্রহনযোগ্যতা নির্ভর করছে বক্তা ও শ্রোতার একটি বিষয়ে ঐক্যমতের ওপর। যদিও বিজ্ঞান প্রমাণভিত্তিক একটি শাস্ত্র কিন্তু বক্তা-শ্রোতা বা প্রস্তাবক গ্রহীতা কাঠামো এখানেও প্রযোজ্য। সুতরাং সব বর্ণনার একটা অভিন্নতা আছে যা তাদের প্রাসঙ্গিকতাকে স্থাপন করে। তার ওপর একটি বর্ণনার প্রনালী দিয়ে আরেকটি বর্ণনার প্রনালীকে পরীক্ষা করাটাও বাস্তবসম্মত নয়। আমরা জিনিসের ওজনকে যেভাবে মাপতে পারি মানুষের ভালোত্বকে একই ভাবে মাপতে পারিনা, যদি আমরা ভালো মানুষ বলে একটি প্রত্যয়কে গ্রহনও করি সর্বসম্মতভাবে। অন্যদিকে বিজ্ঞানচর্চা যতটা সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত তার চেয়ে বেশি ব্যাপৃত তার প্রয়োগযোগ্যতার বিষয়ে। কোন জ্ঞানকে প্রয়োগ করে যদি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটানো যায় তবে সেই জ্ঞান কতটা সত্যের মাপকাঠিতে উত্তীর্ন তা অপ্রধান, বরং তার ব্যবহারিক মূল্য সেই জ্ঞানকে মহিমান্বিত করে তোলে। এই ভাবে উত্তর আধুনিক যুগের জ্ঞান-চর্চার মানচিত্র নির্মান করেছেন,যা কিনা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিচ্ছে জ্ঞানসমূহকে মূল্যায়নের ব্যাপারে। যেমন প্রায়োগিক সমাজবিজ্ঞান অনেক বেশি আদৃত তাত্ত্বিক সমাজবিজ্ঞানের চাইতে।

উপসংহার:

প্রবন্ধের একটি সীমাবদ্ধাতার উল্লেখ করে কিছু মন্তব্য সন্নিবেশিত করা হলো। পাঠক বিতর্কের সমাধান প্রত্যাশা করে। এই প্রবন্ধ সেই উদ্দেশ্যে রচিত নয় এবং বিশেষ বিতর্ক বা বিতর্কসমূহের বিশদ বিশ্লেষণেও উদ্যোগী নয়। বরং লেখকের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। প্রশ্ন উঠতে পারে এই বর্ণনার উপকার কি? ছাত্র-ছাত্রীরা বেশি উপকৃত হবে বলে আমার ধারনা। আমার দীর্ঘদিনের শ্রেণীকক্ষের পাঠদান প্রক্রিয়ায় যে তাত্ত্বিক উপলব্ধি সমূহ তার একটি সংকলন বলা যায়। পাশ্চাত্যের অনেক তাত্ত্বিক মনে করেন যে সমাজ বাস্তবতার স্বরুপ সংক্রান্ত মৌলিক ধারনার বা অনুমানের ওপর যে সব বিতর্ক তার চূড়ান্ত সমাধান সম্ভব নয়, কেননা নুন্যতম অনুমানহীন সমাজবাস্তবতার বর্ণনা সম্ভব নয়। তাই সমাজবিজ্ঞান তত্ত্বসমূহের সমান্তরাল যাত্রার চূড়ান্ত অবসান ঘটানো একটি দুষ্কর কাজ আজ-অব্দী।

সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রারম্ভিক গ্রন্থে একাধিক তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থিতি মনে করিয়ে দেয় যে দেখবার আপেক্ষিকতা এখনও বিরাজমান। ঐক্যমত পরিলক্ষিত হয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নামকরনের বেলায়, সামাজিকিকরন প্রক্রিয়ার উপস্থিতির বেলায়, সামাজিক নিয়ন্ত্রনের প্রয়োজন এর বেলায় বা সামাজিক পরির্বতন সংক্রান্ত্র আলোচনায়। যেখানে ঐক্যমত নেই সেটি হলো প্রতিষ্ঠানের আন্তঃসম্পর্ক আলেচনায়, সামাজিকীকরনে বিভাজন সংক্রান্ত আলোচনায় বা সমাজ পরির্বতনের প্রক্রিয়ায় ভিন্নতর আলোচনায়। সুতরাং সমাজতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান আলোচনা বিতর্ক কেন্দ্রীক হবে, এমনটাও একটি তাত্ত্বিক উপলব্ধি বলে স্বীকৃতি দেয়া যায়।